বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নাগরিক চেতনা
(Civic Spirit to the Emergence of Bangladesh)

ইউনিট ১০

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামোতে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘদিন রাজপথে আন্দোলন করতে হয়েছে। আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলনই এক পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নেয়। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বর্তমান ইউনিটে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের পটভূমি, ভাষা-আন্দোলন, পাকিস্তানে সংবিধান রচনার চেষ্টা, প্রাদেশিক নির্বাচন, সামরিক শাসন, পাকিস্তানের দু'অংশের বৈষম্য, ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১০.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি
(Background of the Independence Movement of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আর্থ-রাজনৈতক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাঙালি সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, শোষণ, নির্যাতন, বৈষম্য, জাতীয়তাবাদ, বৈদেশিক মুদ্রা

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আর দাঙ্গার রক্তক্ষয়ী পটভূমিতে ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয় ভারতবর্ষ। বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন একটি রাষ্ট্র- পাকিস্তান। ঔপনিবেশিক বিভক্তির রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমানের লাখো রক্তাক্ত লাশ আর বাস্তুচ্যুতির অতিদীর্ঘ মিছিল পাকিস্তানের এই 'আচমকা অভ্যুদয়' অনিবার্য করে তোলে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রে অচিরেই বাঙ্গালি নিজেকে নিপীড়িত-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। বাঙ্গালির স্বপ্ন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামোতে পূর্ব বাংলা কেবল অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হয়নি। বাঙ্গালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও হরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নীতি অবলম্বন করে। আর এসব বৈষম্যমূলক নীতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি হিসাবে কাজ করে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল-

(ক) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা বরাবরই ভয়াবহ রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদেই নিয়োগ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান হতে। ১৯৪৭-

৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার এবং তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। পাকিস্তানের রাজধানীও প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। পরে আইয়ুব খান রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেন। পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসন ক্ষমতায়। পূর্ব বাংলার জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হকসহ কেন্দ্র জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্য নীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

(খ) **সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট**

পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে পূর্ব বাংলার জনগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রটিতে শুরু থেকেই বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সামাজিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালিকে 'খর্বাকার', 'অর্ধ-মুসলমান', 'হিন্দু-ঘেঁষা মুসলমান' প্রভৃতি বলে অপমান ও হেয় করত। তারা নিজেদের তথাকথিত যোদ্ধা জাতি হিসাবে প্রচার করে বাঙ্গালিকে 'ভীতু' বলে অবজ্ঞা করত। পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রভুসুলভ মনোভাব আর অহংকারে বাঙ্গালিদের সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র সৃষ্টির স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। তারা অচিরেই বুঝতে পারে ধর্ম জাতি গঠনের একটি উপাদান হলেও কেবল ধর্মের ভিত্তিতে জাতি বা রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। জাতি গঠনের জন্য ভাষা, ঐতিহ্য, ইতিহাস সংস্কৃতির মিল থাকতে হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করা ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালি সংস্কৃতির উপর নীপিড়ন চালিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম আঘাত আসে বাংলা ভাষার উপর। বাংলা ভাষাকে তারা উর্দুর মতো আরবী হরফে লেখার ষড়যন্ত্র করেছিলো। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষ ছিল বাঙ্গালি অন্যদিকে উর্দু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিলো মাত্র ৭ ভাগ। তবু বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানী শাসক ঘোষ্ঠী। বাংলার জনগণ শেষ পর্যন্ত বুকের রক্ত দিয়ে ১৯৫২ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

(গ) **অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট**

পাকিস্তানের দু'অংশে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অত্যন্ত প্রকট। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় অর্থ পাচার হত অবাধে। পশ্চিম পাকিস্তানে যেসব শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে তার বেশির ভাগের অর্থ আসত পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে। বৈদেশিক মুদ্রার তিন ভাগের দু'ভাগ অর্জিত হত পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে। আর এই অর্থ ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তান। বৈদেশিক ঋণের শতকরা ৯০ থেকে ৮৫ ভাগ ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তান আর বাকি ১০ থেকে ১৫ ভাগ খরচ করত পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ লোক, অথচ এই অঞ্চলে ব্যয় করা হত উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ।

(ঘ) সামরিক- প্রশাসনিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙ্গালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিলো অত্যন্ত নগন্য। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙ্গালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিলো যথাক্রমে ৫%, ১০% ও ১৬%। প্রশাসনিক বিভাগের বিভিন্ন স্তরে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। সকল বিভাগের সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রিয় সরকারের কর্মচারিদের মধ্যে ৮৪% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি এবং ১৬% ছিল বাঙালি। বিদেশে পাকিস্তানের মিশনগুলোতেও এ বৈষম্য কার্যকর ছিলো। বিদেশী মিশনগুলোতে ৮৫ ভাগ কর্মচারী ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে উপনিবেশ হিসাবে বিবেচনা করতে থাকে। তারা এ অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক অধিকার হরণ করে সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাতা করে। তবে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এ আধিপত্যকে মেনে নেয়নি। মহান ভাষা

আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালি প্রথম সংঘটিতভাবে পশ্চিমা চক্রান্ত শোষনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অবশেষে চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পাকিস্তানের উদ্ভবের ভিত্তি কী?
ক. সংস্কৃতি খ. সশস্ত্র যুদ্ধ গ. ধর্ম ঘ. ভূ-খন্ডগত ঐক্য

২। পাকিস্তানে উর্দু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ছিলো কত শতাংশ ?
ক. ৭ শতাংশ খ. ১০ শতাংশ গ. ১৭ শতাংশ ঘ. কোনটি নয়

পাঠ-১০.২ পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ভূমিকা
(Emergence and Role of Opposition Political Parties in Pakistan)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পাকিস্তানে মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নাম ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দমননীতি, সশস্ত্র, কোন্দল, স্বার্থ, আদর্শ, নেতাকর্মী, সংগঠন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় অভাবনীয় বিজয় লাভ করে। পূর্ব বাংলার জনগণ তখন মুসলিম লীগকে প্রাণের সংগঠন মনে করত। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ বাঙ্গালির অধিকার আদায়ে উদাসীন হয়ে পড়ে। বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রশ্নে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বাঙ্গালি নেতারা মুসলিম লীগে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। পশ্চিম পাকিস্তানেও মুসলিম লীগের বিরোধিতা শুরু হয়। তবে তা বিশেষ গতি পায়নি। পূর্ব বাংলায় বাস্তবিক অর্থে মুসলিম লীগ বিরোধী একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম গড়ে ওঠে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন মুসলিম লীগ বিরোধী এই ফ্রন্টের মূল তিন নেতা। এ সময় মুসলিম লীগ ও পশ্চিমা শাসক চক্রের বিরোধিতায় বিভিন্ন ছাত্র-যুব-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। নিম্নে পাকিস্তানে কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম ও তাদের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বঙ্গের কংগ্রেসে নেতাকর্মীগণ পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামেই সংগঠিত হয়। ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথম থেকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দলের নেতাকর্মীগণের প্রায় সকলেই হিন্দু হওয়ায় পাকিস্তান সরকার দলটিকে 'ভারতের গুপ্তচর' বলে আখ্যায়িত করে। দলটির নেতা-কর্মীদের ওপর দমন নীতি চালানো হয়। এ অবস্থা ন্যাশনাল কংগ্রেস পাকিস্তানে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারেনি। দলের অনেক নেতাকর্মীই ধীরে ধীরে ভারতে চলে যান। প্রগতিশীল অনেকেই পরবর্তীতে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

২. পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি

১৯৪৮ সালের ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কলকাতা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের উত্তর প্রদেশের কমরেড সাজ্জাদ জহীরকে সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করে পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা পাকিস্তান সরকারকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টির মূলত সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের পথ বেছে নেয়। কমরেড মনি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের হাজং এলাকায়, খুলনার ডুমুরিয়া এলাকায় এবং যশোরের নড়াইল এলাকায় কৃষক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টা চলে। পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে পুলিশী দমন-পীড়নের মাধ্যমে এসব আন্দোলন ব্যর্থ করে দেয়। পার্টির সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার কারণে ১৯৫৪ সালের ২৩ জুলাই পাকিস্তান সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টির ত্যাগী নেতৃবৃন্দ আত্মগোপনের পথ বেছে নেন। অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

৩. আওয়ামী মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগে নিজেদের উপদলীয় কোন্দলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আদুল হামিদ খান ভাসানী কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষাপটে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ তরুণ ও প্রগতিশীল অংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। নতুন দলের সভপতি নির্বাচিত হন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারণ সম্পাদক হন টাঙ্গাইলের শামসুল হক। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দলটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক এবং ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়। ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নিজের ভাবমূর্তি অসাম্প্রদায়িক করতে নাম থেকে'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়। এ সময় দলটির মূলনেতা নির্বাচিত হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড পূর্ব বাংলার স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ায় এ অঞ্চলে দলটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। দলটি গণ-মানুষের প্রাণের সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ে দলটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)

ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে নতুন এ দলটির জন্ম হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় প্রদেশের কর্তৃত্বে দেয়া হবে। দলের কর্মসূচিতে ভূমি সংস্কার, বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদের অঙ্গীকার করা হয। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। ন্যাপ গঠনের পর বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী এ দলে যোগ দেয়ায় দলটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রগতিশীল সংগঠনগুলো এ দলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যুদয় বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙালি স্বার্থ-বিরোধী অবস্থানের কারণে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তায় ধস নামে। এ প্রেক্ষাপটে পূর্ব-পাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের উন্মেষ ঘটে। সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে আবার গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পাকিস্তান সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে কেন?
ক. ভারতের সঙ্গে আঁতাতের কারণে খ. কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনের কারণে
গ. সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার জন্য ঘ. কোনটি নয়

২। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন কে?
ক. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. শামসুল হক

পাঠ-১০.৩ লাহোর প্রস্তাব (Lahore Resolution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- লাহোর প্রস্তাবের প্রধান দিকসমূহ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- পাকিস্তান সৃষ্টিতে লাহোর প্রস্তাবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক চেতনা, দ্বি-জাতি তথ্য, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িক, শাসনতান্ত্রিক সমস্যা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, পাকিস্তান প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। দ্বিজাতি তত্ত্ব নির্ভর লাহোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা হয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ভারতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি ঘটে। তবে আইন সভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এই দুই সম্প্রদায়ের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। এ আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে এ আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশ সমূহের মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত প্রদেশসমূহে মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রবর্তনের চেষ্টা, স্কুলসমূহের পাঠ্যসূচীতে হিন্দু ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলক করণ, সরকারী ভবন সমূহে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি মুসলিম অনুভূতিকে আহত করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (যিনি এক সময় হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন) এসময় তাঁর বিখ্যাত দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। দ্বি-জাতিতত্ত্ব মতে, ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। দ্বি-জাতি তত্ত্বেরই চরম বহিঃপ্রকাশ লাহোর প্রস্তাব। যার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করা হয়।

লাহোর প্রস্তাবের মূলধারাসমূহ

অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ২৪ মার্চ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাবের মূল ধারাগুলো হল-

(১) নিখিল ভারত মুসলিম লীগ দৃঢ়তার সাথে পুনঃঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা রয়েছে তা এ দেশের উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত অসঙ্গত ও অকার্যকর। তা ভারতীয় মুসলমানদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

(২) সমস্ত সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুনভাবে বিবেচনা না করা হলে মুসলিম ভারত অসন্তুষ্ট হবে। মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে সংবিধান রচিত হলে তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে তার জন্য মুসলিম লীগ দু'টি প্রস্তাব করেঃ (ক) ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, (খ) প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে ভারতেবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান

এলাকাগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ 'Independent States' গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

(৪) এ সমস্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানে কার্যকর রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক রাষ্ট্র সত্তার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে এ. কে. ফজলুল হক মনে করেন, বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা বাঙালি মুসলমানদের হাতে আসবে এবং এ ক্ষমতা তারা নিজেরা ভোগ করবে, কোন কেন্দ্রিয় কর্তৃত্বের হাতে তুলে দিবে না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মনে করেন, এর ফলে প্রত্যেক প্রদেশ তার উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিজাতি তত্ত্ব যুক্ত এবং একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করায় এ. কে. ফজলুল হক পরবর্তীতে এটি সমর্থন করেন নি। কারণ লাহোর প্রস্তাবে দ্বি-জাতি তত্ত্ব বা পাকিস্তান শব্দের উল্লেখ ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত অবাঙালি নেতাদের তৎপরতায় এবং গণমাধ্যমের প্রচারে দ্রুত লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর ফলে মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাঙালি নেতৃবৃন্দের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়।

অন্যদিকে, কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভাগকে 'পাপ কাজ' বলে মন্তব্য করেন। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি গঠনকে অবান্তর বলে মন্তব্য করেন। কলকাতার পত্রিকাগুলো লাহোর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে এবং একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে আখ্যায়িত করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	লাহোর প্রস্তাব মূল্যায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব অপরিসীম। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। মুসলমানরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তাদের জন্য পৃথক আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারও মুসলমানদের দাবী মেনে নেয়। ভারত বিভক্তির মাধ্যমে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। লাহোর প্রস্তাব জিন্নাহ ঘোষিত দ্বি-জাতি তত্ত্বেরই একটি রাজনৈতিক সংস্করণ। মূলত লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলমাদের জন্য অন্তত দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়েছিল। অবশ্য এর ভিত্তিমূল ছিল সাম্প্রদায়িক চেতনা। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে?
   ক. হোসেন শহীদ সহরাওয়ার্দী খ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
   গ. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ঘ. কোনটি নয়

২. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি কী ?
   ক. অসাম্প্রদায়িক চেতনা খ. সাম্প্রদায়িক চেতনা গ. জাতীয়তাবাদ ঘ. বাঙালির স্বাধিকার

পাঠ-১০.৪ ভাষা আন্দোলন (Language Movement)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পূর্ব-বাংলায় ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক এবং এ সম্পর্কে বাঙালি-অবাঙালিদের মনোভাব জানতে পারবেন।
- ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রভাষা, প্রস্তাব, ঘোষণা, পতাকা দিবস, ১৪৪ ধারা, বিক্ষোভ, তাজা প্রাণ, শহীদ মিনার

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসক গোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই প্রতিবাদ করে। তারা উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করার ন্যায়সঙ্গত দাবি তোলে।

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু এবং বাংলা ভাষা নিয়ে বিতর্ক ছিল। বিশেষত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ভাষা ছিল উর্দু। ঢাকার নবাব পরিবারেরও ভাষা ছিল উর্দু। ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনেও উর্দু-বাংলার বিতর্ক দেখা দেয়। মুসলিম লীগ প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে চালুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতার বিরোধিতায় সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বাহ্নে নতুন রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্র ভাষা' কি হবে তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকে দু'টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

প্রথম পর্যায় (১৯৪৮-১৯৫০) : ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণ পরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসাবে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় তা বাতিল হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে হরতাল পালিত হয়। ২১ মার্চ জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। জিন্নাহর ২৪ মার্চ বক্তৃতার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত ছাত্ররা 'না' 'না' ধ্বনি করে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৫২ সাল): বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের সঙ্গে লিখিত চুক্তি হয়। চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও (১৫ই মার্চ ১৯৪৮), নাজিমুদ্দীন তা ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব। ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারির সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট ও সভা-সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সাথে 'পতাকা দিবস' পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ আমরণ অনশন শুরু করেন। নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন। শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেন। সংগ্রামী ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরনো কলাভবন প্রাঙ্গনে মিলিত হয়। পুলিশি বেষ্টনী ভেদ করে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন, সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর, জব্বারসহ নাম না জানা কয়েকজন যুবক। পুলিশের গুলিতে আহত হন অন্তত ১০ জন ছাত্র । ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের

আগুন জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী পূর্ণ-দিবস হরতাল পালন করে। ভাষা আন্দোলনে শহীদদের অবদান ও স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহীদ মিনার। ভাষা শহীদ শফিউরের পিতা শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিতে সম্মত হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন নানাবিধ কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্যাগ করে ভাষাকে কেন্দ্র করে নতুন আত্মপরিচয় খুঁজে পায়। রাজনীতি গবেষক বদরুদ্দীন উমরের মতে, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালি মুসলমান নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এর আগে বাঙ্গালি মুসলমান তার আত্মপরিচয় খুঁজে আরবের মরুভূমিতে। মূলত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালির চেতনায় অসাম্প্রদায়িক ভাবনা প্রোথিত হয়।

২। সংহতি ও একাত্মবোধ : ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির সকল স্তরের মধ্যে জাতীয় সংহতি ও একাত্মতাবোধের সৃষ্টি করে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। শুধু ছাত্র-জনতাই নয়, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও এক কাতারে শামিল হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

৩। অধিকার সচেতনতাবোধ : ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতির রাজনৈতিক অধিকার সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়। এর মধ্য দিয়ে বাঙ্গালি জাতি অন্যায়, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শিক্ষা লাভ করে।

৫। যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ : মহান একুশের রক্তদানের ফলে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকশিত হয়, সে চেতনা থেকেই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

৯। স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা : আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্যে। এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ধাপে ধাপে বাঙালি জনগোষ্ঠী ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	"ভাষা আন্দোলনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতিধ্বনি।"- ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রাম ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশে ভাষা-আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পাকিস্তান আমলে বাঙ্গালির প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন। মূলত ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাঙ্গালি মুসলমান আরবের মরুভূমির মায়া ত্যাগ করে বাংলার কাদা জলে নিজের শিকড় খুঁজতে শুরু করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন কে?

ক.ভাষা শহীদ শফিউরের পিতা খ. মাওলানা ভাসানী গ. আব্দুল মতিন ঘ. নুরুল আমীন

পাঠ-১০.৫ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন (Election 1954)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্ট কেন নির্বাচনে জয় লাভ করল তা বলতে পারবেন।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পাবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচনী জোট, ২১ দফা, প্রাদেশিক নির্বাচন, গণজোয়ার, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ইস্তেহার

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ বিরোধী পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী মোর্চা বা জোট গঠন করে। এই জোট 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিত। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল জোট গঠনের মূল উদ্যোক্তা। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুক্তফ্রন্টে মূলত চারটি রাজনৈতিক দল ছিল। এগুলো হল –মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নিজাম-ই-ইসলামী এবং হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। নির্বাচন যুক্তফ্রন্ট প্রতীক হিসাবে বেছে নেয় 'নৌকা' প্রতীক। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভাবের বিরোধিতা ছিল জোটের ভিত্তি। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে গুরুত্ব দিয়ে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে মর্যাদা দান, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন, 'পাট' ব্যবসাকে জাতীয়করণ, পূর্ব বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে তোলা, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ২১ দফায় সংযুক্ত ছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ২৩৭টি আসন। যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। এর মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ১৪৩টি আসন, প্রদত্ত ভোটের ৬৪ ভাগ লাভ করে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট। অন্যদিকে সরকারি দল মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। তা ছিল প্রদত্ত ভোটের ২৭ ভাগ। বাকি ৫টি মুসলিম আসনের ৪টি পায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। একটি পায় খেলাফত-ই-রব্বানী পার্টি। এছাড়া নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনের সবকটিই যুক্তফ্রন্ট লাভ করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন। বিভিন্ন কারণে এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগের অবহেলা, শোষণ আর চক্রান্তের জবাব দেয়। নিম্নে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বা তাৎপর্য আলোচনা করা হল।

১। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল মূলত বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদেরই বিকাশ। এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাঙ্গালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়। বাঙ্গালি জাতি তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো সচেতন হয়ে ওঠে।

২। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব বৃদ্ধি

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ী প্রার্থীরা ছিলেন মূলত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি। অন্যদিকে মুসলিম লীগের প্রার্থীরা ছিলেন জমিদার শ্রেণির কিংবা সাম্প্রদায়িক নেতা। নির্বাচনে মধ্যবিত্ত প্রার্থীদের বিজয়ের কারণে বাংলার রাজনীতিতে

মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। রাজনীতি জমিদার-জোতদার-মোল্লাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতে চলে আসে।

৩। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাই জয়যুক্ত হয়। এর ফলে বাংলার রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা আরো বিস্তৃত হয়।

৪। **মুসলিম লীগের পরাজয়**

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনা, লবণ সংকট, পাট শিল্পজনিত কেলেঙ্কারি, স্বায়ত্তশাসন বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতির ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণ মুসলিম লীগ শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ও ভরাডুবি ঘটে। নির্বাচনের মধ্যদিয়ে মুসলিম লীগ ও অবাঙালী নেতৃত্ব সম্পর্কে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ধারণা পাল্টে যায়।

৫। মুসলিম লীগের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনে অনীহা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে পাকিস্তান আন্দোলনে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উপরন্তু এ ধরনের চিন্তাধারাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ ধরনের বঞ্চনা ও প্রতারণা মেনে নিতে পারেনি।

৬। **যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি**

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে পূর্ব বাংলার সাধারণ কৃষক-শ্রমিক সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল। যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৭। মুসলিম লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব

মুসলিম লীগ থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। মাওলানা ভাসানী ও এ কে ফজলুল হকসহ প্রমুখ নেতার মুসলিম লীগ ত্যাগ দলটিকে দুর্বল করে দেয়।

৮। যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয় নেতৃত্ব

যুক্তফ্রন্টের জয়ের তিন প্রধান নেতা ছিলেন- এ.কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী। এই নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বয়সে তরুণ নেতা ও ছাত্রনেতারা ছিল দলের বড় শক্তি। তরুণ ছাত্ররা এ দলের জয়ের জন্য ভূমিকা রাখেন। বিশেষত শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খানসহ ত্যাগী কর্মীরা দেশব্যাপী যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পাঁচটি কারণ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৫৪ সালের নির্বাচন বিভিন্ন কারণে বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনীতি শেষ হয়ে যায়। ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়ে নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্থান ঘটে আওয়ামী লীগের। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন কারণে ১৯৫৪ এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়েছে। বাঙালি বিরোধী অবস্থান ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে দলটির অনীহা মুসলিম লীগের পরাজয় ডেকে আনে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। যুক্তফ্রন্টে কয়টি রাজনৈতিক দল ছিল?

ক. চারটি খ. পাঁচটি গ. ছয়টি ঘ. কোনটি নয়

পাঠ-১০.৬ ছয় দফা কর্মসূচি (Six Points Program)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ছয় দফার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী শাসকচক্রের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে ছয় দফার গুরুত্ব বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্বায়ত্তশাসন, যুক্তরাষ্ট্রীয়, মুক্তির সনদ, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বৈদেশিক মুদ্রা, প্রদেশ, ষড়যন্ত্র, স্বীকৃতি

বাঙালি জনগোষ্ঠীকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে নন্দিত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের এক কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাব পেশ করেন। ছয় দফা প্রস্তাবকে বঙ্গবন্ধু 'বাঙ্গালির মুক্তিসনদ' হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

ছয় দফা প্রস্তাব

১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির। সরকার হবে সংসদীয় ধরনের। প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইন সভা বা পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র।

৩। দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

৪। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায়কৃত অর্থের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রিয় সরকার পাবে।

৫। বৈদেশিক মুদ্রার ওপর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের জন্য প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

৬। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো 'আধা-সামরিক বাহিনী' বা 'মিলিশিয়া' রাখতে পারবে।

বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা আন্দোলন

পূর্ব বাংলায়ও আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব বিরোধীরা এ প্রস্তাবকে 'ষড়যন্ত্র' হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রত্যাখান করেন। কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন ছয় দফা প্রশ্নে অবিচল। তিনি সরাসরি ছয়দফা নিয়ে জনগণের দরবারে হাজির হলেন, তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। মার্চ মাসে তিনি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ডেকে ৬-দফা কর্মসূচি অনুমোদন করিয়ে নেন। অর্থাৎ শেখ মুজিব এককভাবে ছয়দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন, পরবর্তীতে তিনি দলের স্বীকৃতি আদায় করেন।

ছয় দফার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

ছয় দফার প্রশ্নে পাকিস্তানের শাসক চক্রের মনোভাব ছিলো অত্যন্ত নেতিবাচক। পাকিস্তানের দু'অংশেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ছয় দফার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচারণা চালিয়েছে। কেননা ছয় দফা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মূলে আঘাত করে। আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও মুদ্রা পাচার রোধের বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্র দিশেহারা হয়ে পড়ে। লাহোরে ছয় দফা উত্থাপিত হবার পরদিনই পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যা দেয়া হয়। করাচীতে পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী আব্দুল হাই চৌধুরী ছয় দফাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান মন্তব্য করেছিলেন, 'ছয় দফার পরিণতি

হবে গৃহযুদ্ধ'। তিনি সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ নিরসনে শেখ মুজিব ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দেন। পাকিস্তানী শাসক চক্র ১৯৬৬ হতে ১৯৬৯ পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই শেখ মুজিবকে কারাগারে আটক রাখে। ছয় দফার পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য আওয়ামী লীগে নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে।

ছয় দফার গুরুত্ব

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ছয়দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

১। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ছয়দফা ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই ছয় দফাকে 'বাংলার কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

২। স্বায়ত্তশাসনের দাবি : ছয় দফা মূলত বাঙালির অধিকারের দাবি। বস্তুতপক্ষে, ছয় দফার মধ্যদিয়েই পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে অধিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়েছিল।

৩। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ছয় দফাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের চরম বিকশ ঘটে। জাতীয়তাবাদের বিকাশে কেবল ভাষা-সংস্কৃতিই ভূমিকা রাখে না। অর্থনৈতিক স্বার্থও জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। ছয় দফা ছিল বাঙ্গালির অর্থনৈতিক স্বার্থকেন্দ্রিক।

৪। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি : বাঙ্গালির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করায় পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতে, ছয় দফাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের 'র‍্যাডিক্যাল' আন্দোলন শেখ মুজিবের হাতে অর্পিত হয়।

৫। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয় : বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারে ১৯৭০ এর নির্বাচনকে ছয় দফা প্রশ্নে 'গণভোট' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছয় দফা প্রস্তাবকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ছয় দফা ও বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছয় দফার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ছয় দফা বস্তুতপক্ষে বাঙ্গালির মুক্তি সনদ। এ কারণে ছয়দফাকে ব্রিটিশ 'ম্যাগনা কার্টা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়। পাকিস্তানী শাসক চক্র ছয় দফার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বাঙালি জনগোষ্ঠী ছয় দফা প্রশ্নে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। বাংলার রাজনীতি সরব হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ এই রাজনীতিই পরে পাল্টে দেয় পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ছয়দফার মূল বিষয় কী ছিল ?

ক. বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তি খ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
গ. সাধারণ নির্বাচনের দাবি ঘ. উপরের সবকটি

২। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন্ শহরে ছয় দফা উত্থাপিত হয়?

ক. করাচী খ. ইসলামাবাদ
গ. রাওয়াল পিন্ডি ঘ. লাহোর

পাঠ-১০.৭ ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান (Mass Upsurge of 1969)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঐতিহাসিক আগড়তলা মামলা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে ঊনসত্তরের-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রক্ষমতা, ত্রিপুরা, মিথ্যা অভিযোগ, আসামী, গণবিস্ফোরণ, গোলটেবিল, বৈঠক

১৯৬৬ সালে ছয় দফা উত্থাপিত হওয়ার পর দ্রুত তা বাংলার গ্রামগঞ্জে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি ছয়দফা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। এরই প্রেক্ষাপটে দায়ের করা হয় ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা। আগরতলা মামলা ছিল সামরিক একনায়ক আইয়ূব খানের শাসনামলের এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। বাঙ্গালির অধিকার আদায়ের লড়াই নস্যাৎ করতে এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির ময়দান হতে নির্মূল করতে পাকিস্তানী শাসক চক্র এ ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে।

রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগে ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার আর্জিতে বলা হয়, অভিযুক্তরা পাকিস্তানের একটি বিশেষ দিনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারকে উৎঘাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেছে। পরিকল্পনা মতে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে (পূর্ব পাকিস্তানকে) 'স্বাধীন' হিসাবে ঘোষণা করবে। রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করে, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় অভিযুক্তরা ভারতীয় কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার সাথে এ ষড়যন্ত্রের 'নীল নকশা' প্রণয়ন করে। অভ্যুত্থান সফল করার জন্য তারা ভারতীয়দের নিকট থেকে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করেন বলে অভিযোগ করা হয়। যদিও পরবর্তীতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আগরতলা মামলার প্রথমদিকে শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্ত করা হয়নি। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে পূর্বের ২৮ জনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনা'র অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়। এক্ষেত্রে অভিযোগনামায় বলা হয়, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ও ভারতের সহযোগিতায় অভিযুক্ত সামরিক সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার রাজনীতি ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ছয় দফার স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ), জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ (দোলন গ্রুপ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ূব বিরোধী 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে । আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সংবাদ সম্মেলন করে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনেন্স বাতিলসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে এ কর্মসুচি ঘোষণা করা হয়।

গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নিম্নে '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হল।

১। গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানকে সামাল দেওয়ার জন্য আইয়ূব খান ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে সব দলের অংশ গ্রহণে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে।
গ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হবে।

২। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার : ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনকে আসামী করে যে ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খান সে মামলা প্রত্যাহার করে। বঙ্গবন্ধুসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

৩। আইয়ূব খানের পতন : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ূব সরকারের পতন ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আইয়ূব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

৪। ১৯৭০ সালের নির্বাচন : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের শাসন কাঠামো ভেঙে পড়ে। নতুন জান্তা সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। এতে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

৫। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ : ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ গণ-অর্ভ্যুত্থান ছিল বাঙ্গালির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফল। গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত ১৯৬৯ এর গণবিস্ফোরণের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে।

৬। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্ব: ১৯৬৯এর গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। মুক্তি পাগল ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। বস্তুত '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম 'টার্নিং পয়েন্ট'। বাঙ্গালির স্বপ্নের বাহকে পরিণত হন তিনি।

৭। রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের আবির্ভাব : বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের পর দীর্ঘদিন জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজ বিপ্লবী ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা কী? আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান কোন একটি বিশেষ কারণ বা হঠাৎ করে সংঘটিত হয়নি। পূর্ব বাংলার প্রতি দীর্ঘ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ এ গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি ছিল গণ-অভ্যুত্থানের তাৎক্ষণিক কারণ। এ অভ্যুত্থানের পরই বাংলার রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ বঙ্গবন্ধুর হাতে চলে যায়। একই সঙ্গে ছাত্র-সমাজ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির মূল শক্তি হয়ে ওঠে। ছয়দফা ও ১১ দফার মিলিত শক্তি পাকিস্তানী শাসক চক্রকের ক্ষমতা-কাঠামো ভেঙ্গে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু কী?
ক. বাংলার স্বায়ত্তশাসন খ. জেনারেল আইয়ূব খানের পতন
গ. ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন ঘ. কোনটি নয়

২। ছাত্র সমাজের ১১ দফার সঙ্গে কোন আন্দোলন সম্পর্কিত?
ক. ভাষা আন্দোলন খ. ৬-দফা আন্দোলন
গ. ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ঘ. অসহযোগ আন্দোলন

পাঠ-১০.৮ ১৯৭০ এর নির্বাচন ও ফলাফল (Election of 1970 and Its Results)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বলতে পারবেন।
- নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ১৯৭০ এর নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামরিক শাসন, জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ, ইশতেহার, নিরঙ্কুশ, অঞ্চলভিত্তিক, জনবিচ্ছিন্নতা

অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে তিনি ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা প্রদান করেন।

১৯৭০ এর নির্বাচন ও প্রতিদ্বন্দ্বি রাজনৈতিক দলসমূহ

জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯ ডিসেম্বর। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের জলোচ্ছ্বাস-দুর্গত এলাকার আসনে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৪টি রাজনৈতিক দল এবং বেশ কিছু স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) ন্যাপ (ওয়ালী খান), মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, জামায়াত-ই-ইসলামী, জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম, জমিয়তে উলা'মা-ই-পাকিস্তান, নিজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রোটিক পার্টি (পি.ডি.পি) ইত্যাদি।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন (৭টি মহিলা আসনসহ) লাভ করে। বাকি দু'টি আসনের মধ্যে ১টি লাভ করে পিডিপি নেতা নুরুল আমীন এবং অপর আসনটি লাভ করেন নির্দলীয় প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় চৌধুরী। জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান। এতে পশ্চিম পাকস্তানী শাসক চক্র বিপাকে পড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জাতীয় পরিষদে কোন আসন পায়নি। জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে ভূট্টোর পিপলস পার্টি। এছাড়া ৬টি আসন পায় ন্যাপ (ওয়ালী খান), ৯টি মুসলিম লীগ (কাইউম খান), ৭টি মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), ২টি মুসলিম লীগ (কনভেনশন), ৭টি জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান, ৭টি জমিয়তে উলামায়-ই-ইসলাম, ৪টি জামায়াত-ই-ইসলামী এবং ১৩টি পায় নির্দলীয় প্রার্থী। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে ও পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করতে পারেনি। স্পষ্টতই এ নির্বাচন ছিল অঞ্চলভিত্তিক। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। প্রদত্ত ভোটের ৮৯ ভাগ পায় দলটি। বাকী ১২টি আসনের মধ্যে ৯টি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, ২টি পিডিপি এবং ১টি জামায়াত-ই-ইসলামী। আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসন সহ নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে সর্বমোট ২৯৮টি আসন লাভ করে।

আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় সাফল্য লাভের পেছনে কতগুলো বিষয় গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নিম্নে তা আলোচনা করা হল।

১। ছয় দফা প্রস্তাব : আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছয় দফা ভিত্তিক দাবি পূর্ববাংলার জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে নির্বাচনে জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে মূলত তাদের দাবির প্রতি সমর্থন দান করেছে।

৩। বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি : জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি। বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে ছিলেন সংগ্রামী ও আপোষহীন। আর এ কারণে ১৯৭০ এর অগ্নিগর্ভ সময়ে বাঙ্গালি এক বাক্যে মুজিবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

৪। ভাসানীর নির্বাচন বর্জন: পূর্ব বাংলার একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল ন্যাপ (ভাসানী) নির্বাচন বর্জন করেছিল 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগানে। কাজেই পূর্ব বাংলায় ন্যাপ নির্বাচন বর্জন করায় আওয়ামী লীগের শক্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলো না।

৫। মুসলিম লীগের জনবিচ্ছিন্নতা: ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে গণ-স্বার্থ বিরোধী ভূমিকার কারণে দলটি পূর্ব বাংলায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নির্বাচনে মুসলিম লীগের অকল্পনীয় ভরাডুবি আওয়ামী লীগের বিজয়ের আরেকটি কারণ।

১৯৭০ এর নির্বাচনের গুরুত্ব

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭০ এর নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিপাকে পড়ে যায়। শেখ মুজিব তথা বাঙ্গালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। নিম্নে ১৯৭০ এর নির্বাচনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হল।

(১) নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জয় হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদেরই বিজয়।

(২) জনগণ ছয়দফা প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগের ছয় দফা থেকে সরে আসার পথ খোলা ছিল না।

(৩) এই নির্বাচনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়, পাকিস্তান ভৌগোলিক কারণে কার্যত বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেননা পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল বা নেতার পাকিস্তানের দু'অংশে গ্রহণযোগ্যতা ছিল না।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭০ এর নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি (মহিলা আসনসহ) আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে দলটি পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন পায় নি। ভুট্টোর পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮টি আসন (মহিলা আসনসহ) লাভ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন পায় নি। নির্বাচনে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল ছয় দফা প্রস্তাব ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মোহনী নেতৃত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। 'আইনগত কাঠামো আদেশ' জারি করেন কে?
ক. আইয়ূব খান খ. ইয়াহিয়া খান গ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. নুরুল আমীন

২। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে?
ক. ২৮৮টি খ. ১৬৭ টি গ. ১৬৯ টি ঘ. ৩১৩ টি

পাঠ-১০.৯ অসহযোগ আন্দোলন (Non-cooperation Movement)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অসহযোগ আন্দোলনের কারণ ও এর প্রতি বাঙালির সমর্থন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অধিবেশন, স্থগিত, ঐতিহাসিক ভাষণ, অগ্নিগর্ভ সময়, স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। পাকিস্তানী শাসক চক্র দিশেহারা হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ভাল ফলাফল করবে এমনটা ধারণা করা হলেও দলটি সরকার গঠনের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে এমনটা পাকিস্তানী জান্তা সরকার ভাবতে পারেনি। এ প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের আসন্ন ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা না করে অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেন। বস্তুত ১ মার্চ হতেই পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। জনগণের মারমুখি মনোভাব ও অসহযোগ আন্দোলনে ভীত হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ ঘোষণা করেন, '২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে'।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙ্গালির ইতিহাসের এক মহেন্দ্রক্ষণ। এদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণে ৪টি দাবি উত্থাপন করেন। যথা– (১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, (২) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (৩) গণহত্যার তদন্ত ও বিচার করতে হবে এবং (৪) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধের দিক নির্দেশনাও প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, তিনি যদি হুকুম (নির্দেশ) দিতে নাও পারেন, বাঙ্গালি যেন যুদ্ধ চালিযে যায়। বাঙ্গালির মনোবল জাগ্রত করতে তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।' তিনি পাকিস্তানী সেনাদের 'ভাতে মারার' 'পানিতে মারার' গেরিলা কৌশল ঘোষণা করেন। ভাষণের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু কৌশলগত কারণে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যক্ত করে বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

১৯৭১ এর মার্চের অগ্নিগর্ভ সময়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান না করলেও ছাত্র-জনতা-ইপিআর-বাঙ্গালী-সেনা সদস্যদের কাছে তা ছিল 'গ্রীন সিগন্যাল'। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের মতে, অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃত কর্মসূচি ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু কার্যত 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। কেননা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই পরবর্তী ১৯ দিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন, আদালত, ব্যাংক-বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছে। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান নির্বিশেষে রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেছিল, বিশ্বে তা নজিরবিহীন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া প্রদান করে ছাত্র-জনতা-পুলিশ-শ্রমিক-সরকারী কর্মচারী পাকিস্তানী শাসক চক্রকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অসহযোগিতা শুরু করে। এ কারণে ভেঙ্গে পড়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকেই কার্যত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া প্রদান করে পূর্ব বাংলায় সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, সচিবালয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, নিম্ন আদালত, হাইকোর্ট, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাংক-বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ অমান্য করে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া সরকার কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে সরকারী-কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়। এর পাল্টা জবাব হিসাবে ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু ৩৫ দফা ভিত্তিক এক নির্দেশনামা জারি করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের কারণে সেনাবাহিনী ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানের সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থা উপলব্ধি করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনা চললেও বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। ১৯ মার্চ ভূট্টোর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় যোগ দেন। দফায় দফায় আলোচনা চললেও তা কোন ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। তারপরই শুরু হয় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড 'অপারেশন সার্চলাইট।'

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ এর ভাষণ এর মূল বক্তব্য কী?

সারসংক্ষেপ

জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অনিচ্ছার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া প্রদান করে ছাত্র-জনতা-আইনজীবী-শ্রমিক-পুলিশ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসন পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের কারণে সেনাবাহিনী ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানের সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ৭ মার্চের ভাষণে নিম্নোক্ত কোন্ দাবিটি ছিল না?
ক) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে (খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
(গ) জেনারেল ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়তে হবে এবং
(ঘ) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

২। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন কে?
ক. জেনারেল ইয়াহিয়া খান খ. জেনারেল টিক্কা খান
গ. জেনারেল নিয়াজী ঘ. জুলফিকার আলী ভুট্টো

পাঠ-১০.১০ স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
(Declaration of Independence and Liberation War 1971)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বঙ্গবন্ধু কিভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তা বলতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণপ্রতিরোধ ও সম্মুখ যুদ্ধে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসর্মপন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সময়ক্ষেপন, নীল নকশা, অপারেশন, সার্চলাইট, গণহত্যা, স্বাধীনতার ঘোষণা, আত্মত্যাগ স্বীকৃতি, আত্মসমর্পণ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে সামরিক আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বস্তুত শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর আলোচনা ছিল সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সময়ক্ষেপণ। কেননা এ সময় প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পি.আই.এ ফ্লাইট বোয়িং ৭০৭ বিমান সৈন্য ও গোলা-বারুদ নিয়ে ঢাকায় আসত। অসংখ্য জাহাজ সৈন্য ও ভারী অস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভীড়ে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক *'উইটনেস টু সারেন্ডার'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান, লে. জে. খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' বা বাঙ্গালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার 'নীল নকশা' প্রণয়ন করেন। ২০ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত অনুমোদন করেন।

২৫ মার্চ রাত সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারী অস্ত্র-শাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় প্রথম হামলার শিকার হয় ফার্মগেট এলাকায় মিছিলরত বাঙ্গালি ছাত্র-জনতা। একই সঙ্গে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় পাক সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। বাঙ্গালি পুলিশ ও ইপিআর সদস্যরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ শুরু করলেও ভারী অস্ত্রের কাছে পরাজয় বরণ করে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চালানো হয় সবচেয়ে নৃসংশ হত্যাকাণ্ড।

২৫ মার্চ একইভাবে গণহত্যা চলে পুরান ঢাকার তাঁতিবাজার, শাখারি পট্টি, কচুক্ষেত, মিরপুর, রায়ের বাজার, গণকটুলি, ধানমন্ডিসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়। অপারেশন সার্চ লাইটের হত্যাযজ্ঞ কেবল ঢাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। কুমিল্লা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বগুড়া, সৈয়দপুর, সিলেটসহ পুর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নৃসংশ গণহত্যা সংঘটিত করে। রাত দেড়টার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমান্ডো সৈন্য ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতে আক্রমণ করে বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতাকে গ্রেপ্তার করে। তবে তার আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিআর (বর্তমান বিডিআর) এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী সেনারা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যায় লিপ্ত হয়। নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙ্গালির ওপর বিভৎস এ আক্রমণ অখন্ড পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। আনুমানিক রাত দেড়টার দিকে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাটি ছিল ইংরেজীতে, যাতে বলা হয়– "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan

occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."(সূত্র : হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খন্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ: ১)

এর বাংলা অর্থ –''এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'' বাংলাদেশের *স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খন্ড*'-এ বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ইপিআর ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে এই বাণীটিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ স্থাপনায় পৌঁছে দেন।

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি ২৫ মার্চ রাতেই চট্টগ্রাম ওয়্যারলেস বিভাগ পৌঁছে দেয়। তিনি এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য এম, এ, হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার অনুবাদ করেন। সে রাতেই তা সাইক্লোস্টাইল করে লিফলেট আকারে চট্টগ্রামে বিলি করা হয়। মাইকযোগেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ প্রচার করে। ২৬ মার্চ দুপুরে কালুর ঘাটে স্থাপিত 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' হতে এম, এ হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি রেডিওতে পাঠ করেন। পরবর্তীতে আবুল কাশেম সন্দীপসহ আরো কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে দেশবাসী যাতে জেনে আশ্বস্ত হন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষিত বাঙালি জওয়ানগণও জনগণের সাথে যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসা বাঙালি সেনা সদস্যগণের মধ্যে যোগাযোগ ও ঐক্যবদ্ধতা সৃষ্টির প্রয়োজনে রণকৌশলগত কারণে ২৭ মার্চ 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' এর বিদ্রোহী কর্মীরা মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করার অনুরোধ করেন। মেজর জিয়া সানন্দচিত্তে তা গ্রহণ করে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

১৯৭১ সালে ঢাকায় নিয়োজিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ অফিসার সিদ্দিক সালিক *Witness to Surrender* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে লিখেছেন- "Soon after darkness fell on March 25 (1971) the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, Sheikh Mujib proclaimed East Pakistan to be the Peoples Republic of Bangladesh, He called on Bengaliz to go underground to reorganize and to attack the invaders."

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উক্তি থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসে দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেওয়ার পরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হন। বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে নানারূপ বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষাপটে মহামান্য হাইকোর্ট বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ, দলিল পর্যালোচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে রায় দেয়। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগও বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকার

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করতে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। মুজিবনগর সরকারের প্রধান সদর দপ্তর প্রথমে মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায়) স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই ছিল মুজিব নগর সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

গণপ্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা লাভ

২৫ শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ চালালে বাঙ্গালি ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর সদস্য, সেনাবাহিনী সাহসিকতার সঙ্গে রুখে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের একেবারে সূচনা পর্বে বাঙ্গালির প্রতিরোধ অসংগঠিত হলেও তা হতে স্পষ্ট হয়ে যায়, বাঙ্গালি ছাত্র জনতা, পুলিশ, ইপিআর ও সেনাসদস্য বিনা চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ছাড় দিবে না। সেই প্রতিরোধ আরো স্পষ্ট ছিল বাঙ্গালি স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত। সূচনা পর্বের সশস্ত্র প্রতিরোধ ছিল স্বত:স্ফূর্ত ও আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধকারীরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পাননি। তথাপি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে রুখে দাঁড়ায়।

মুক্তিযুদ্ধকে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকার দেশের যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করে। ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় মুক্তিফৌজ বা মুক্তিবাহিনী। এর প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত হন আতাউল গণি ওসমানী। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান একতরফাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৫ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় তাদের সৈন্য পাঠায়। ভারত-বাংলাদেশের সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হয় 'মিত্র বাহিনী'। মিত্র বাহিনী ও গণবাহিনী একযোগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ৭ ডিসেম্বর যশোর সেনানিবাস দখল করে নেয়। অত:পর যৌথবাহিনী সাতক্ষীরা দখল করে খুলনার দিকে অগ্রসর হয়। মিত্র বাহিনীর একটি দল টঙ্গী, জামালপুর, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ মুক্ত করে অগ্রসর হয় রাজধানী দিকে। বিদেশী নাগরিকদের ঢাকা ত্যাগ করার সুযোগ দিয়ে ১০ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী সর্বপ্রকার বিমান হামলা বন্ধ রাখে। ১২ ডিসেম্বর মুক্ত হয় কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ। মুক্ত টাঙ্গাইলে স্বাধীনতার পতাকা উড়ে ১৩ ডিসেম্বর। টাঙ্গাইল পতনের পর পাকিস্তানি শাসক ও সৈন্যরা বুঝতে পারে বাংলাদেশ দখলে রাখা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আরেক দফা গণহত্যা চালায় পাকিস্তান সেনাবাহনী। এ হত্যাযজ্ঞে অংশ নেয় হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন আলবদর, আল শামস বাহিনী। তারা শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর। ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেন জেনারেল এ কে নিয়াজী। নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীল ও সুপরিকল্পিত করতে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের রণক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে। ডিসেম্বরের শুরুতে ভারত-বাংলাদেশের সেনাবাহিনী নিযে গঠিত হয় মিত্র বাহিনী। মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হতবিহবল হয়ে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী রেসকোর্স উদ্যানে আত্মসমর্পণ করে। ৩০ লাখ শহীদের আত্নদানে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখ?

ক. ৪ এপ্রিল খ. ১০ এপ্রিল গ. ১৭ এপ্রিল ঘ. ২৬ মার্চ

২। মুজিবনগর সরকার দেশের যুদ্ধ ক্ষেত্রকে কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করে?

ক. ৯ টি খ. ১১টি গ. ২১টি ঘ. কোনটি সত্য নয়

পাঠ-১০.১১ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ (Spirit and Ideology of Liberation War)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রাষ্ট্র পরিচালনা ও সংবিধানে এসব আদর্শ ও চেতনার তাৎপর্য আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আদর্শ, প্রস্তাবনা, মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন, অসাম্প্রদায়িকতা

বাংলাদেশ এক সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত এবং চার লাখ নির্যাতিত নারীর ত্যাগের মহিমায় বাংলাদেশের জনগণ লাভ করে স্বাধীনতা। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তা এক অনন্য ঘটনা। যেসব মহান আদর্শ বাংলাদেশের জনগণকে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং যে সব স্বপ্ন (সাম্য, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আর ধর্মনিরপেক্ষতা) বাস্তবায়নে ১৯৭১ সালে বাঙালি কৃষক-শ্রমিক-জনতা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে সেগুলোই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়ঃ

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তির জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা, সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

বস্তুত বাঙালির চেতনায় ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সমুজ্জ্বল থাকায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে এ চারটি আদর্শকে সংযুক্ত করেন। বাংলাদেশ সংবিধানকে এ কারণেই তিনি 'শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এই চারটি নীতির বাইরেও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা স্বাধীনতার চেতনা ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ একটি কল্পিত ভাবমূর্তি। এক অনন্য রাজনৈতিক চেতনা। সব থেকে ক্ষুদ্র যে জাতিগোষ্ঠী তারাও পরস্পরকে চেনে-জানে না। কিন্তু কিছু ভিন্ন উপাদান একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কল্পিত সম্প্রদায়ের বোধ (imagined community) সৃষ্টি করে। যা অন্যদের থেকে তাদের পৃথক করে দেয়। সৃষ্টি করে পৃথক 'আমরা বোধ'। আরোপ করে ভিন্ন সত্তা বা পরিচিতি। পরে এই অভিন্ন পরিচিতির সূত্র জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিয়ে যায়। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে বাংলাদেশ সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৯) বলা হয়েছে– ''ভাষা ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।''

সাম্য ও সমাজতন্ত্র

সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণ এবং বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ন্যস্ত করা হয়। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ১০) বলা হয়, ''মানুষে মানুষে শোষণের অবসানসহ একটি ন্যায়ানুগ ও সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা হবে।'' বস্তুত, বাংলাদেশের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা-অর্থে সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে।

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন হতে বাঙালি জনগোষ্ঠী গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতিদের একটি প্রধানতম স্বপ্ন ছিল প্রজাতন্ত্রে আইনের শাসন বাস্তবিক অর্থেই প্রতিষ্ঠা পাবে। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ সেই স্বপ্নের নিশ্চয়তাও রয়েছে। কাজেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা।

অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের তকমা দিয়ে কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়ন না করা। এ দ্বারা অনেকে ধর্মহীনতা বুঝে থাকেন। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অবস্থান, অর্থাৎ ধর্ম থাকবে, তবে রাষ্ট্র ধর্মের কারণে নাগরিকদের কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না। অর্থাৎ 'ধর্ম-যার যার রাষ্ট্র সবার'। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠায় বাঙালি হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ, বাঙালি মুসলমানের মতোই রক্ত দিয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ধর্মীয় পরিচয় ভুলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি নারীদেরই নির্যাতন করেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা তাই যে কোন ধর্মাবলম্বীর রক্তের দাবি।

মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ১৭৮৯ সালে মার্কিন সংবিধান এবং ১৯৪৯ সালের ভারত সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গণপরিষদ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় ভাগে, ২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। মৌলিক অধিকার মোট ১৮টি যার মধ্যে রয়েছে; আইনের চোখে সমতা (অনুচ্ছেদ-২৭), চিন্তা, বিবেক এবং বাক স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-৩৯.১), সংগঠনের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-৩৮), নাগরিকের সম্পত্তি লাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ-৪২.১) স্বাধীনভাবে পেশা বা বৃত্তির নির্বাচনের অধিকার (অনুচ্ছেদ-৪০), আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সর্বোপরি ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান সুযোগ লাভ (অনুচ্ছেদ-২৮)।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জনগণকে যেসব মহান আদর্শ ও দর্শন দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলোই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ। এইসব আদর্শ ও চেতনার মধ্যে প্রধানত রয়েছে- বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মৌলিক অধিকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা। কাজেই স্বাধীন বাংলাদেশে এসব প্রায় অগ্রসর দর্শন ও চেতনাকে সমুজ্জ্বল রাখা এবং এসবের বিরুদ্ধে আঘাত আসলে তা প্রতিরোধ করা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্তর্ভূক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। বাংলাদেশ সংবিধানকে বঙ্গবন্ধু কী নামে আখ্যায়িত করেন ?
ক. শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান খ. উত্তম সংবিধান
গ. গণ-মানুষের সংবিধান ঘ.বিপ্লবী সংবিধান

২। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ কোন্‌টি?
ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ খ. ধর্মনিরপেক্ষতা
গ. অর্থনৈতিক মুক্তি ঘ. সাম্প্রদায়িকতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইয়াকুব সাহেব পাকিস্তানের দুটি অংশের গল্প বলছিলেন নাতী ফিরোজকে। ফিরোজ জানতে চায় একই দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন এত গরিব ছিলাম। দাদা তখন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। এমনিভাবে বৈদেশিক সাহায্যও বেশি করে ব্যয় হত পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। এর পর দাদা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, এত শোষণের পরও পূর্ব পাকিস্তান কখনো আলাদা বা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলেনি, চেয়েছিল কেবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার।
(ক) পাকিস্তানের দুটি অংশ কত মাইল বিদেশি অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল?
(খ) পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত মর্যাদা কী ছিল? ব্যাখ্যা করুন।
(গ) ইয়াকুব সাহেবের মতে বৈদেশিক সাহায্যের সিংহ ভাগ কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হত?
(ঘ) ইয়াকুব সাহেবের শেষ উক্তিটি-বিশ্লেষণ করুন।

২। শিশির একটি কারখানায় চাকরি করত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কারখানার অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করে। তাদের দেখাদেখি একদিন সে বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার চাকরি এবং পরিবার কিছুই ফিরে পায়নি।
(ক) ৬ দফা কর্মসূচি কে উত্থাপন করেন?
(খ) গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করুন।
(গ) শিশির মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) শিশির ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান-মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪ : ১। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫ : ১। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১ : ১। ক ২। ঘ